সাতদিন

৬ জুন : জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচএম এরশাদ সকালে সৌদি আরব যাওয়ার আগে দ্বিতীয় স্ত্রী বিদিশাকে তালাক ঘোষণা করেন।

ব্যাংকের সঞ্চয়পত্র জাল করে ১২ কোটি টাকার আত্মসাৎ চক্রের মূল হোতাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

৭ জুন : যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিমানবাহিনীর একটি এফ-৭ যুদ্ধ বিমান বিধ্বস্ত হয়।

ময়মনসিংহে সড়ক দুর্ঘটনায় অর্থোপেডিক সার্জন ডা. সাইদুল ইসলাম ও তার সহকারী নুরুল ইসলাম নিহত হন।

৮ জুন : রাজধানীর মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনে কালসী বিহার কলোনিতে আগুন লেগে শতাধিক ঘর পুড়ে গেছে। আহত ১৫ জন।

খুলনায় পুলিশের তালিকাভুক্ত দুই শীর্ষ সন্ত্রাসী নিহত।

৯ জুন : জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের বাৎসরিক বাজেট ঘোষণা।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জের কাছে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ জন নিহত ও ৪০ জন আহত।

১০ জুন : ধানমন্ডির ২৭ নম্বরে রাপা প্লাজার তিন তলার এক জুয়েলারি দোকান থেকে ৫০ লাখ টাকার স্বর্ণালঙ্কার লুট।

বাজেট ঘোষণায় সিমকার্ডের মূল্য বৃদ্ধি।

১১ জুন : প্রায় ১ মাস বন্ধ থাকার পর বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশের ১১ ট্রাক ইলিশ মাছ ভারতে রপ্তানি হয়।

রাজধানীতে তরুণী ও মহিলাসহ ৫ জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু।

১২ জুন : গরম ও রোদ্রতাপে যশোরের চার গ্রামে ভূমি ফাটল হয়।

কক্সবাজারে সন্ত্রাসী আবছারের আস্তানায় অস্ত্র উদ্ধারের সময় পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ।

প্রসঙ্গ সিইসি

পদ্ধতি পরিবর্তন

প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সিইসি হিসেবে বিচারপতি আজিজের নিয়োগ নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোরও প্রচন্ড আপত্তি ছিল। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে সরকার সিইসি নিয়োগ করবে এটাই ছিলো সকলের প্রত্যাশা। কিন্তু সেই আশা পূরণ হয়নি। ১১ জুন হাইকোর্ট ডিভিশনের একটি বেঞ্চ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি এমএ আজিজের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ স্বভাবতই জনমনে আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি করবে। হাইকোর্ট প্রাথমিক শুনানি শেষে আগামী ১৮ জুন আবার শুনানির জন্য দিন ধার্য করেছেন।

অতীতে বিচারপতি এমএ রউফ ও বিচারপতি একেএম সাদেকের সিইসি নিয়োগ নিয়ে আদালতে মামলা হয়েছিল। কিন্তু মামলাগুলো বিচারাধীন থাকা অবস্থায় তারা সিইসি পদে বহাল না থাকায় আদালত সম্ভবত মামলাগুলোর সাংবিধানিক বিতর্ক নিষ্পত্তি করার প্রয়োজন মনে করেননি। তবে জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট মামলা হিসেবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এ ধরনের শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া জরুরি।

সিইসি পদে বিচারপতিগণের নিয়োগ নিয়ে স্বাধীনতার পর থেকেই প্রশ্ন ছিল। পাকিস্তানি এই ট্র্যাডিশন বাংলাদেশ বজায় রেখেছে। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন শুরু থেকেই নব্বই দশক পর্যন্ত প্রায় আধাডজন বিচারক সিইসি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। গণতান্ত্রিক ভারত কখনো সেইদিকে যায়নি। জনগণের শ্রদ্ধাভাজন ও তর্কের ঊর্ধ্বে থাকা বিচারপতিগণের অবস্থান পুঁজি করে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে জনসাধারণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যই ক্ষমতাসীনরা বিচারকদের সিইসি পদে বসাতে আগ্রহী বলে অনেকে মনে করেন। বিএনপি এই বৃত্তের বাইরে আসতে পারেনি। আওয়ামী লীগ অবশ্য এ ধারা থেকে সরে এসেছিল। তবে রাজনীতিকরাই সিইসি নিয়ে অনভিপ্রেত তর্ক তুলে সময়ে সময়ে ইস্যু সৃষ্টি করেছে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এমনই যে, সিইসি পদে যাকেই বসানো হোক, শুধু বিরোধিতার কারণে বিরোধিতা যেন হবেই।

নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে সংবিধান দৃশ্যত রাষ্ট্রপতির হাতে যে ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে বাস্তবে তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যকর পরামর্শেই বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। বহুদিন থেকে নিয়োগ রীতি নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিতর্ক চলতে থাকলেও এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করা হচ্ছে না। এমনকি বিদায়ী সিইসি এমএ সাঈদও বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব হলো নির্বাচন কমিশনার, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য এবং কম্পট্রোলার অব অডিট জেনারেল নিয়োগ পদ্ধতিতে এমন পরিবর্তন আনা আবশ্যক, যাতে কোনো এক দলের রাজনৈতিক বিবেচনা নিরঙ্কুশভাবে প্রাধান্য লাভ না করতে পারে।

ভূমি জরিপ আতঙ্ক

সারা দেশে চলছে পর্যায়ক্রমে ভূমি জরিপের কাজ। ভূমি জরিপের নামে চলছে অনিয়ম, দুর্নীতি। মাঠ পর্যায় ভূমি জরিপ কর্মকর্তাদের কবলে পড়ে সাধারণ মানুষকে শেষ সম্বল হারাতে হচ্ছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ভূমি জরিপের মাঠ কর্মকর্তারা পরিকল্পিতভাবে সমস্যার সৃষ্টি করছে। জীবিত ব্যক্তিকে মৃত দেখিয়ে তার জমি অন্যের নামে রেকর্ড করিয়ে দেয়া হচ্ছে। ভূমি জরিপের বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ড এবং স্বেচ্ছাচারিতার কারণে দেশের বিভিন্ন জেলায় কয়েক লাখ আপত্তি ও আপিল মামলা বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে। ভূমি জরিপের নানা অনিয়মের কারণে বাড়ছে সামাজিক সহিংসতা, অবিশ্বাস।

২০০৪ সালের সারা বছর ধরে গোপালগঞ্জ জেলায় ভূমি জরিপের কাজ পরিচালিত হয়। সরেজমিনে মাঠ পর্যায় কর্মকর্তাদের সঙ্গে থেকে দেখা গেছে, উত্তরাধিকার ভাগবাটোয়ারা, মালিকানার দলিল বিভিন্ন বিষয়ে খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে তারা সমস্যা সৃষ্টি করে। পারস্পরিক বিবাদ সৃষ্টি করে দু'পক্ষের কাছ থেকে অর্থ নিচ্ছে মীমাংসার নামে।

১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির পর সাধারণ মানুষ জমিতে মালিকানার স্বত্ব ফিরে পায়। এরপর আজ অবধি দেশে কোনো পূর্ণাঙ্গ জরিপ কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। সূত্র জানায়, '৫০ সালের দিকে এ দেশে ভূমি জরিপের কাজ শুরু হয়। আজ অবধি তা চলছে। গত ৫৪ বছরেও দেশের কোনো জেলায় পূর্ণাঙ্গ ভূমি জরিপের কাজ শেষ হয়নি। ভূমি জরিপ অধিদপ্তরের ১৯৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশে মোট জমির পরিমাণ ৩ কোটি ৬২ লাখ ৬৫ হাজার একর। এর মধ্যে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ২ কোটি ১৫ লাখ ৬০ হাজার একর। মোট জমির মধ্যে আবার ৬ লাখ ৬২ হাজার একর খাস জমি রয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সারা দেশে ভূমি জরিপের নামে তিন পর্বে চলছে টাকার খেলা। প্রথম পর্যায়ে ভূমির সীমানা নির্ধারণ। মাঠ পর্যায় একজন সর্দার আমিন, একজন বদর আমিন ও একজন চেইনম্যানের নেতৃত্বে গঠিত টিম কাজ করে। দ্বিতীয় পর্যায় ম্যাপ তৈরি এবং তৃতীয় পর্যায় ভূমির কাগজপত্র যাচাই। এর প্রতিটি পর্যায়ে ভূমি মালিকদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে মোটা অঙ্কের টাকা।

> ভূমি জরিপের নামে বেশি হয়রানি হচ্ছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আদিবাসীরা। মালিকানায় রেকর্ড থাকতেও অর্পিত সম্পত্তি (শত্রু) বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে

এমনকি সরকারি খাস জমি ব্যক্তির নামে রেকর্ড করিয়ে দেয়া হচ্ছে। এর বিনিময়ে মোটা অঙ্কের অর্থ নেয়া হচ্ছে। কার্যত ভূমি জরিপের নামে কোটি টাকার খেলা চলছে। তার ভাগ পৌঁছে যাচ্ছে বিভিন্ন পর্যায়ে।

কোনো জেলায় ভূমি জরিপের কাজ শুরু হলে বিভিন্ন জেলা থেকে অধিদপ্তরের লোক নিয়ে আসা হয়। অন্য জেলা থেকে কর্মকর্তা ও কর্মচারী এসে এক বছর কাজ করে চলে যায়। এক বছরে তারা আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়ে যায়।

ভূমি জরিপের নামে বেশি হয়রানি হচ্ছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আদিবাসীরা। মালিকানায় রেকর্ড থাকতেও অর্পিত সম্পত্তি (শত্রু) বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। টাকা দিতে ব্যর্থ হলে সম্পত্তি অর্পিতের নামেই রেকর্ড হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে আদিবাসীদের জমির মালিকানায় কাগজপত্র না থাকায় তারা তীব্র সমস্যায় পড়ছে।

ভূমি জরিপ সম্পর্কে ভূমি প্রতিমন্ত্রী উকিল আবদুস সাত্তার ২০০০কে বলেন, 'মাঠ পর্যায় অতি সতর্কতার সঙ্গে ভূমি জরিপের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জরিপের কারণে ভোগান্তিতে না পড়ে সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' তিনি বলেন, 'ভূমি জরিপের ক্ষেত্রে আগামীতে কম্পিউটার পদ্ধতি চালু করা হবে। ঢাকার ডেমরায় পরীক্ষামূলভাবে তা ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে।' কার্যত মন্ত্রীর নিরপেক্ষ ও কর্মকর্তার সঙ্গে ভূমি জরিপের কাজের নির্দেশ মাঠ পর্যায় পৌঁছায়নি। সাধারণ মানুষের দাবি, মাঠ পর্যায় ভূমি জরিপের কাজ তদারকির জন্য মন্ত্রণালয়ের কড়া মনিটরিং করা একান্ত প্রয়োজন।

খুলনা জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতি

১৯ কোটি টাকার হদিস নেই

খুলনা বিভাগীয় জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতির নামে ২০ বছর ধরে চাঁদা আদায়ের ১৯ কোটি টাকার কোনো হিসাব নেই। দীর্ঘদিন নির্বাচন ছাড়াই সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক পদ দখল হয়ে আছে।

খালিশপুর পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা তেল কোম্পানির ডিলার, পাম্প মালিকসহ তেল ব্যবসায়ীরা ১৯৮৫ সালে এ সমিতি গঠন করে (রেজি: খ: ৭২১)। তখন থেকেই সমিতির সভাপতি সিরাজ গাজী ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ফরহাদ হোসেন। সভাপতি সিরাজ গাজীর কোনো তেলের ব্যবসা নেই বলে অন্যদের অভিযোগ। তিনি খুলনার আন্ডারওয়ার্ল্ডের কিংবদন্তি নেতা গাজী কামরুলের ভাই, সেটাই তার পুঁজি।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, সমিতির জন্মলগ্ন থেকে যেকোনো ট্যাঙ্কলরি মালিককে এ সমিতির সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক। নিয়ম হলো, প্রতিটি ট্যাঙ্কলরি মালিকদের গাড়িপ্রতি ৫০ হাজার ১ টাকা করে চাঁদা দিয়ে সদস্য হতে হয়। সেই হিসাবে ১৮৬টি ট্যাঙ্কলরি থেকে আদায় হয়েছে ৯ কোটি ৩০ লাখ ১৮৬ টাকা। একইভাবে ১৯৬টি ট্যাঙ্কলরির প্রতিদিন পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা ডিপো থেকে তেল গ্রহণকালে গাড়িপ্রতি ২০ টাকা করে চাঁদা দেয়াও বাধ্যতামূলক।

তেল ব্যবসায়ীদের মতে, প্রতিদিন তিনটি তেল ডিপো থেকে দুই শতাধিক ট্যাঙ্কলরি তেল গ্রহণ করে। ফলে চাঁদা আদায় হয় ২০০x২০ হারে প্রতিদিন ৪ হাজার, মাসে ১ লাখ ২০ হাজার এবং বছরে হয় ১৪ লাখ ৪০ হাজার। এ হিসাবে গত ২০ বছরে খরচ বাদে ১০ কোটি টাকা জমা হবার কথা। এছাড়া ওই সমিতির নামে তিনটি ট্যাঙ্কলরি রয়েছে যার লাভও জমা থাকার কথা।

সমিতির সদস্যদের অভিযোগ, আন্ডারওয়ার্ল্ড সংশ্লিষ্টদের নাম

খুলনা মহানগরীতে পানির তীব্র সংকট

খুলনা মহানগরীতে পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। প্রতিদিন তিন কোটি গ্যালন পানির চাহিদা থাকলেও। কেসিসি (খুলনা সিটি করপোরেশন) সরবরাহ করছে অর্ধেকেরও কম। ফলে নগরীর অনেক এলাকায় পর্যাপ্ত পানি পৌঁছায় না। পানি সংকট নগরবাসীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় দুর্বিষহ যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেসিসি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, উৎপাদক নলকূপ, গভীর নলকূপ এবং একটি ছোট সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট থেকে প্রাপ্ত পানি নগরীবাসীকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট থেকে প্রতিদিন দেড় লাখ গ্যালন পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয়। বাকিটা উৎপাদক ও গভীর নলকূপের মাধ্যমে পাওয়া যায়। নগরীতে প্রায় ৪৮টি উৎপাদক নলকূপ, ২ হাজারের বেশি গভীর এবং ৭ হাজারের ওপরে অগভীর নলকূপ রয়েছে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, অধিক উত্তোলনের কারণে মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। ফলে অসংখ্য গভীর নলকূপে পানি উঠছে না। কোনো কোনো এলাকায় উৎপাদক নলকূপেও পানি পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েক হাজার অগভীর নলকূপ পানির স্তর না পাওয়ায় অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া মহানগরীর কতিপয় বাড়ির মালিক কেসিসি'র পানি সাপ্লাইয়ের মূল পাইপের সঙ্গে মোটর সংযোগ দিয়ে অবৈধভাবে পানি তুলছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণেও অনেক সময় পানি উত্তোলন ও সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি, কেসিসি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পানি সরবরাহ করতে পারছে না। যার কারণে পানি সংকট খুলনা মহানগরীর একটি নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

> কয়েক হাজার অগভীর নলকূপ পানির স্তর না পাওয়ায় অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া মহানগরীর কতিপয় বাড়ির মালিক কেসিসি'র পানি সাপ্লাইয়ের মূল পাইপের সঙ্গে মোটর সংযোগ দিয়ে অবৈধভাবে পানি তুলছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণেও অনেক সময় পানি উত্তোলন ও সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়

কেসিসি'র পানি সরবরাহ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল হান্নান জানান, চাহিদার অর্ধেক পানি তারা সরবরাহ করছেন। 'অন্তরবর্তীকালীন পানি সরবরাহ' প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আরো ৮০ লাখ গ্যালন অতিরিক্ত পানি প্রতিদিন সরবরাহ করা যাবে। ৩৪ কোটি টাকা সরকারি অর্থায়নে এ প্রকল্পের আওতায় ৩০টি পানির পাম্প স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

খুলনা মহানগরীর পানি সংকট পরিস্থিতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, পানি বিশেষজ্ঞ, পরিবেশ কর্মী, বিশিষ্ট নাগরিকসহ সবাই উদ্বিগ্ন। মাটির নিচ থেকে অত্যধিক পানি উত্তোলনের কারণে অদূর ভবিষ্যতে পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি স্কুলের ডিন প্রফেসর ড. মোঃ রেজাউল করিম মনে করেন, সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট হলে খুলনার পানি সমস্যা বহুলাংশে সমাধান হবে। সে ক্ষেত্রে গল্লামারীর ময়ূর নদকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা যেতে পারে।

খুলনা মিউনিসিপ্যালিটির সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এনায়েত আলী বলেন, কেসিসি'র উচিত নাগরিকদের মৌলিক ৪টি সেবা নিশ্চিত করা। এগুলো হচ্ছে পানি সরবরাহ, নগরী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, রাস্তার বাতি দেয়া এবং রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করা। তিনি অভিযোগ করে বলেন, মহানগরীর নাগরিকরা এ মৌলিক অধিকারগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হচ্ছেন।

মল্লিক শুধাংশু *খুলনা থেকে*

ব্যবহার করে সভাপতি সিরাজ গাজী কোনো হিসাব-নিকাশ দেন না। হয় না কোনো সাধারণ নির্বাচন। আবার প্রতিবাদ করলে প্রাণ চলে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।

জ্বালানি তেল ব্যবসায়ীদের ওপর এই হয়রানিমূলক চাঁদা আদায়ের প্রতিবাদে গত মাসে বাংলাদেশ ট্যাঙ্কলরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের জন্ম হয়েছে। এর সভাপতি যশোরের মনিরুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন তৌহিদুজ্জামান। এ সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দ সাজ্জাদুল করিম কাবুল। নবগঠিত বাংলাদেশ ট্যাঙ্কলরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুজ্জামান ২০০০কে বলেন, তারা বাধ্য হয়েই এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। খুলনা বিভাগীয় জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতির ফান্ডের ১৯ কোটি টাকার কোনো হিসাব নেই। হিসাব চাইতে গেলে তাদের জীবননাশের হুমকি দেয়া হয়। তিনি বলেন, সভাপতি সিরাজ গাজীর কোনো তেলের ব্যবসা নেই। তবুও তিনি ২০ বছর ধরে সভাপতি। কোটি কোটি টাকা লুটপাট করছেন।

> প্রতিদিন তিনটি তেল ডিপো থেকে দুই শতাধিক ট্যাঙ্কলরি তেল গ্রহণ করে। ফলে চাঁদা আদায় হয় ২০০ক্স২০ হারে প্রতিদিন ৪ হাজার, মাসে ১ লাখ ২০ হাজার এবং বছরে হয় ১৪ লাখ ৪০ হাজার। এ হিসাবে গত ২০ বছরে খরচ বাদে ১০ কোটি টাকা জমা হবার কথা

সিরাজ গাজী তার তেলের ব্যবসা আছে বলে ২০০০-এর প্রতিবেদকের কাছে দাবি করলেও, তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কোথায় তা সুনির্দিষ্টভাবে দেখাতে পারেননি। সমিতির ১৯ কোটি টাকা লোপাটের ব্যাপারে তিনি অভিযোগকারীকে তার কাছে নিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। তবে তিনি একটানা ২০ বছর সমিতির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

শুভ্র শচীন, *খুলনা থেকে*